অগ্নিবাণ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

অগ্নিবাণ....................2

ব্যোমকেশ হাবুলকে চেয়ারে বসাইয়া দিল....................11

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া....................20

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য....................29

পরদিন সকালবেলা....................35

ইহার পর পাঁচ ছয় দিন....................44

পুলিস আসিয়া পৌঁছতে বিলম্ব হইল না....................52

অগ্নিবাণ

খবরের কাগজখানা হতাশ হস্ত-সঞ্চালনে আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'নাঃ–কোথাও কিছু নেই, একেবারে ফাঁক। এর চেয়ে কাগজওয়ালারা সাদা কাগজ বের করলেই পারে। তাতে ছাপার খরচটা অন্তত বেঁচে যায়।'

আমি খোঁচা দিয়া বলিলাম, 'বিজ্ঞাপনেও কিছু পেলে না? বল কি? তোমার মতে তো দুনিয়ার যত কিছু খবর সব ঐ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের মধ্যেই ঠাসা আছে।'

বিমর্ষ মুখে চুরুট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না, বিজ্ঞাপনেও কিছু নেই। একটা লোক বিধবা বিয়ে করতে চায় বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কুমারী ছেড়ে বিধবা বিয়ে করবার জন্যেই গোঁ ধরেছে। কেন, ঠিক বোঝা গেল না। নিশ্চয় কোনও বদ মতলব আছে।'

'তা তো বটেই। আর কিছু?'

'আর একটা বীমা কোম্পানি মহা ঘটা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তারা স্বামী-স্ত্রীর জীবন একসঙ্গে বীমা করবে, এবং জোড়ার মধ্যে একটাকে কোনও রকমে পটল তোলাতে পারলেই অন্য জন টাকা পাবে। এইসব বীমা কোম্পানি এমন করে তুলেছে যে, মরেও সুখ নেই।'

'কেন, এর মধ্যেও বাদ মতলব আছে নাকি?'

'বীমা কোম্পানির নিজের স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের মনে দুবুদ্ধি জাগিয়ে তোলাও সৎকার্য নয়।'

'অর্থাৎ? মানে হল কি?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, হৃদয়ভারাক্রান্ত একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল, তারপর কড়িকাঠের দিকে অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরবে ধূম উদগিরণ করিতে লাগিল।

শীতকাল; বড়দিনের ছুটি চলিতেছিল। কলিকাতার লোক বাহিরে গিয়া ও বাহিরের লোক কলিকাতায় আসিয়া মহা সমারোহে ছুটি উদযাপন করিতেছিল। কয়েক বছর আগেকার কথা, তখন ব্যোমকেশের বিবাহ হয় নাই।

আমরা দুইজনে চিরন্তন অভ্যাসমত সকালে উঠিয়া একত্র চা-পান ও সংবাদপত্রের ব্যবচ্ছেদ করিতেছিলাম। গত তিন মাস একেবারে বেকারভাবে বসিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের ধৈর্যের লৌহ-শৃঙ্খলও বোধ করি ছিড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। দিনের পর দিন সংবাদপত্রের নিষ্প্রাণ ও বৈচিত্র্যহীন পৃষ্ঠা হইতে অপদার্থ খবর সংগ্রহ করিয়া সময় আর কাটিতে চাহিতেছিল না। আমার নিজের মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতেছিলাম, ব্যোমকেশের মস্তিষ্কের ক্ষুধা ইন্ধন অভাবে

কিরূপ উগ্র ও দুর্বাহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করি নাই; বরঞ্চ এই অনীপ্সিত নৈষ্কর্মের জন্য যেন সে-ই মূলতঃ দায়ী্‌, এমনিভাবে তাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছি।

আজ প্রভাতে তাহার এই হতাশাপূর্ণ ভাব দেখিয়া আমার একটু অনুশোচনা হইল। মস্তিষ্কের খোরাক সহসা বন্ধ হইয়া গেলে সুস্থ বলবান মস্তিষ্কের কিরূপ দুর্দশা হয়, তাহা তো জানিই, উপরন্তু আবার বন্ধুর খোঁচা খাইতে হইলে ব্যাপারটা নিতান্তই নিষ্কারুণি হইয়া পড়ে।

আমি আর তাহাকে প্রশ্ন না করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে খবরের কাগজখানা খুলিলাম।

এই সময়ে চারিদিকে সভা সমিতি ও অধিবেশনের ধুম পড়িয়া যায়, এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সংবাদ-ব্যবসায়ীরা সরসতর সংবাদের অভাবে এইসব সভার মামুলি বিবরণ ছাপিয়া পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা ও থিয়েটার-সাকাসের বিজ্ঞাপন সচিত্র ও বিচিত্ররূপে আমোদ-লোলুপ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

দেখিলাম, কলিকাতাতেই গোটা পাঁচেক বড় বড় সভা চলিতেছে। তা ছাড়া দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার অধিবেশন বসিয়াছে। ভারতের নানা দিগদেশ হইতে অনেক হোমরা-চোমরা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একজোট হইয়াছেন এবং বাক্যধুমে বোধ করি দিল্লীর আকাশ বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সংবাদপত্রের মারফত যতটুকু ধুম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারই ঠেলায় মস্তিষ্ক কোটরে কুল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

আমি সময় সময় ভাবি, আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা কাজ না করিয়া এত বাগবিস্তার করেন কেন? দেখিতে পাই, যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি তার চতুর্গুণ বাগ্মী। বেশি কিছু নয়, স্টীম এঞ্জিন বা এরোপ্লেনের মত একটা যন্ত্রও যদি ইহারা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের বাচালতা ধৈর্য ধরিয়া শুনিতাম। কিন্তু ও সব দূরে থাক, মশা মারিবার একটা বিষও তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বুজরুকি আর কাহাকে বলে!

নিরুৎসুকিভাবে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিবরণ পড়িতে পড়িতে একটা নাম দৃষ্টি আকর্ষণ করিলইনি কলিকাতার একজন খ্যাতনামা প্রফেসর ও বিজ্ঞান-গবেষক-নাম দেবকুমার সরকার। বিজ্ঞান-সভায় ইনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। অবশ্য ইনি ছাড়া অন্য কোনও বাঙালী যে বক্তৃতা দেন নাই, এমন নয়, অনেকেই দিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ করিয়া দেবকুমারবাবুর নামটা চোখে পড়িবার কারণ, কলিকাতায় তিনি আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের বাসার কয়েকখানা বাড়ির পরে গলির মুখে তাঁহার বাসা। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না, কিন্তু তাঁহার পুত্র হাবুলের সম্পর্কে আমরা তাঁহার সহিত নেপথ্য হইতেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়ছিলাম।

দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুল কিছুদিন হইতে ব্যোমকেশের ভক্ত হইয়া পড়িয়ছিল। ছোকরার বয়স আঠারো-উনিশ, কলেজের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। ভালমানুষ ছেলে, আমাদের সম্মুখে বেশি কথা বলিতে পারিত না, তদগতভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া এই অস্ফুটবাক ভক্তের

পূজা গ্রহণ করিত; কখনও চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিত। হাবুল একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইত।

এই হাবুলের পিতা কিরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, জানিবার জন্য একটু কৌতুহল হইল। পড়িয়া দেখিলাম, দেশী বৈজ্ঞানিকদের অভাব অসুবিধার সম্বন্ধে ভদ্রলোক যাহা বলিয়াছেন, তাহা নেহাত মিথ্যা নয়। ব্যোমকেশকে পড়িয়া শুনাইলে তাহার মনটা বিষয়াস্তরে সঞ্চারিত হইয়া হয়তো একটু প্রফুল্ল হইতে পারে, তাই বলিলাম, 'ওহে, হাবুলের বাবা দেবকুমারবাবু বক্তৃতা দিয়েছেন, শোনো।'

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইল না, বিশেষ ঔৎসুক্যও প্রকাশ করিল না। আমি্‌ , পড়িতে আরম্ভ করিলাম–

'এ কথা সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও জাতি বড় হইতে পারে নাই। অনেকের ধারণা এইরূপ যে, ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরাভূখ এবং তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি নাই—এই জন্যই ভারত পরনির্ভর ও পরাধীন হইয়া আছে। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, ভারতের গরিমাময় অতীত তাহার প্রমাণ। নব্য-বিজ্ঞানের যাহা বীজমন্ত্র, তাহা যে ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল ও পরে কাশপুষ্পের বীজের ন্যায় বায়ুতাড়িত হইয়া দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা সুধীসমাজে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। গণিত, জ্যোতিষ, নিদান, স্থাপত্য-এই চতুস্তম্ভের উপর আধুনিক বিজ্ঞান ও তৎপ্রসূত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, অথচ ঐ চারিটি বিজ্ঞানেরই জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

'কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে আমাদের এই অসামান্য উদ্ভাবনী প্রতিভা নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? আমরা কি মানসিক বলে পূর্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি? না–তাহা নহে। আমাদের প্রতিভা অ-ফলপ্রসূ হইবার অন্য কারণ আছে।

'পুরাকালে আচার্য ও ঋষিগণ-যাঁহাদের বর্তমানকালে আমরা savant বলিয়া থাকি–রাজ-অনুগ্রহের আওতায় বসিয়া সাধনা করিতেন। অর্থচিন্তা তাঁহাদের ছিল না, অর্থের প্রয়োজন হইলে রাজা সে অর্থ যোগাইতেন; সাধনার সাফল্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, রাজকোষের অসীম ঐশ্বর্য তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দিত। আচার্যগণ অভাবমুক্ত হইয়া কুণ্ঠাহীন-চিত্তে সাধনা করিতেন এবং অন্তিমে সিদ্ধি লাভ করিতেন।

'কিন্তু বর্তমান ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অবস্থা কিরূপ? রাজা বৈজ্ঞানিক-গবেষণার পরিপোষক নহেন-ধনী ব্যক্তিরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমিত আয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া উঞ্ছবৃত্তির সাহায্যে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়; ফলে আমাদের সিদ্ধিও তদুপযুক্ত হইয়া থাকে। মুষিক যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও হস্তীকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে না, আমরাও তেমনই বড় বড় আবিক্রিয়ায় সফল হইতে পারি না; ক্ষুধাক্ষীণ মস্তিষ্ক বৃহতের ধারণা করিতে পারে না।

'তবু আমি গর্ব করিয়া বলিতে পারি, যদি আমরা অর্থের অভাবে পীড়িত না হইয়া অকুণ্ঠ-চিত্তে সাধনা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা জগতের কোনও জাতির নিকটেই

নূযন হইয়া থাকিতাম না। কিন্তু হায়! অর্থ নাই-কমলার কৃপার অভাবে আমাদের বাণীর সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তবু, এই দৈন্য-নির্জিত অবস্থাতেও আমরা যাহা করিয়াছি, তাহ নিন্দার বিষয় নহে–শ্লাঘার বিষয়। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরিতে যে সকল আবিস্ক্রিয়া মাঝে মাঝে অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়া আবিষ্কতাঁকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে। আবিষ্কারক নিজের গোপন আবিষ্কার সযত্নে বুকে লুকাইয়া নীরবে আরও অধিক জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরিতেছে; কিন্তু সে একাকী, তাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই; বরঞ্চ সর্বদাই ভয়, অন্য কেহ তাহার আবিষ্কার-কণিকার সন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা আত্মসাৎ করিবে। লোলুপ, পরস্বগৃধ্ন চোরের দল চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

'তই বলিতেছি—অর্থ চাই, সহানুভূতি চাই, গবেষণা করিবার অবাধ অফুরন্ত উপকরণ চাই, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে নিষ্কণ্টকে যশোলাভের নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা চাই। অর্থ চাই—'

'থামো।'

প্রফেসর মহাশয়ের ভাষাটি বেশ গাল-ভরা, তাই শব্দপ্রবাহে গা ভাসাইয়া পড়িয়া চলিয়াছিলাম। হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'থামো।'

'কি হল?'

‘চাই—চাই–চাই। আর আস্ফালন ভাল লাগে না। বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপনা চক্কর।‘

আমি বলিলাম, ‘ঐ তো মজা। মানুষ নিজের অক্ষমতার একটা-না-একটা সাফাই সর্বদাই তৈরি করে রাখে। আমাদের দেশের আচার্যরাও যে তার ব্যতিক্রম নয়, দেবকুমারবাবুর লেকচার পড়লেই তা বোঝা যায়।’

ব্যোমকেশের মুখের বিরক্তি ও অবসাদ ভেদ করিয়া একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, ‘হাবুল ছোকরা দেখতে হাবাগোবা ভালমানুষ হলেও ভেতরে ভেতরে বেশ বুদ্ধিমান। তার বাবা হয়ে দেবকুমারবাবু এমন ইয়ের মত আদি-অন্তহীন বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান কেন, এই আশ্চর্য!’

আমি বলিলাম, ‘বুদ্ধিমান ছেলের বাবা হলেই বুদ্ধিমান হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। দেবকুমারবাবুকে তুমি দেখেছ?’

‘ঠিক বলতে পারি না। তাঁকে দেখবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কখনও প্রাণে জাগেনি। তবে শুনেছি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছেন। নিবুদ্ধিতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?’ বলিয়া ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে চক্ষু মুদিল।

ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া শেষে পুটরামকে আর এক দফা চা ফরমাস দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ

সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।' কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া আবার ঠেসান দিয়া বসিয়া বিরস স্বরে বলিল, 'হাবুল। তার আবার কি হল? বডড তাড়াতাড়ি আসছে।'

মুহূর্ত পরেই হাবুল সজোরে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার চুল উস্কো খুস্কো, চোখ দুটা যেন ভয়ে ও অভাবনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনার আঘাতে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এমনিতেই তাহার চেহারাখানা খুব সুদর্শন নয়, একটু মোটাসোটা ধরনের গড়ন, মুখ গোলাকার, চিবুক ও গণ্ডে নবজাত দাড়ির অন্ধকার ছায়া-তাহার উপর এই পাগলের মত আবির্ভাব; আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, 'কি হে হাবুল! কি হয়েছে?'

হাবুলের পাগলের মত দৃষ্টি কিন্তু ব্যোমকেশের উপর নিবদ্ধ ছিল; আমার প্রশ্ন বোধ করি সে শুনিতেই পাইল না, টলিতে টলিতে ব্যোমকেশের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'ব্যোমকেশদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমার বোন রেখা হঠাৎ মরে গেছে।' বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ হাবুলকে চেয়ারে বসাইয়া দিল

ব্যোমকেশ হাবুলকে হাত ধরিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ তাহাকে শান্ত করা গেল না, সে অসহায়ভাবে কাঁদিতেই লাগিল। বেচারার বয়স বেশি নয়, বালক বলিলেই হয়; তাহার উপর অকস্মাৎ এই দারুণ ঘটনায় একেবারে উদভ্রান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হাবুলের যে বোন আছে, এ খবর আমরা জানিতাম না; তাহার পরিবারিক খুঁটিনাটি জানিবার কৌতুহল কোনও দিন হয় নাই। শুধু এইটুকু শুনিয়াছিলাম যে, হাবুলের মাতার মৃত্যুর পর দেবকুমারবাবু আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতাটি সপত্নী-পুত্রকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, ইহাও আঁচে-আন্দাজে বুঝিয়েছিলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়া হাবুল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। দেবকুমারবাবু কয়েক দিন হইল দিল্লী গিয়াছেন; বাড়িতে হাবুল, তাহার অনূঢ়া ছোট বোন রেখা ও তাহাদের সৎমা আছেন। আজ সকালে উঠিয়া হাবুল যথারীতি নিজের তে-তলার নিভৃত ঘরে পড়িতে বসিয়াছিল; আটটা বাজিয়া যাইবার পর নীচে হঠাৎ সৎমার কণ্ঠে ভীষণ চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল; দেখিল, সৎমা রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উর্ধ্বস্বরে প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহার প্রলাপের কোনও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হাবুল রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বোন রেখা উনানের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। কি হইয়াছে জানিবার জন্য হাবুল তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রেখা উত্তর

দিল না। তখন তাহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেই হাবুল বুঝিল, রেখা নাই, তাহার গা বরফের মত ঠাণ্ডা, হাত-পা ক্রমশ শক্ত হইয়া আসিতেছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া হাবুল আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমি এখন কি করব, ব্যোমকেশদা? বাবা বাড়ি নেই, তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম। রেখা মরে গিয়েছে-উঃ! কি করে এমন হল, ব্যোমকেশদা?'

হাবুলের এই শোক-বিহ্বল ব্যাকুলতা দেখিয়া আমার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। ব্যোমকেশ হাবুলের পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'হাবুল, তুমি পুরুষমানুষ, বিপদে অধীর হয়ো না। কি হয়েছিল রেখার, বল দেখি–বুকের ব্যামো ছিল কি?'

'তা তো জানি না।'

'কত বয়স?'

'ষোল বছর, আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট।'

'সম্প্রতি কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছিল? বেরিবেরি বা ঐ রকম কিছু?'

'না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর বলিল, 'চল তোমার বাড়িতে। নিজের চোখে না দেখলে কিছুই ধারণা করা যাচ্ছে না। তোমার বাবাকে 'তার করা দরকার, তিনি এসে পড়ুন। কিন্তু সে দুঘণ্টা পরে করলেও চলবে। আপাতত একজন ডাক্তার চাই। তোমার বাড়ির কাছেই ডাক্তার রুদ্র থাকেন না? বেশ–এস অজিত।'

কয়েক মিনিট পরে দেবকুমারবাবুর বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়িখানার সম্মুখভাগ সঙ্কীর্ণ যেন দুই দিকের বাড়ির চাপে চ্যাপ্টা হইয়া ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়া গিয়াছে। নীচের তলায় কেবল একটি বসিবার ঘর, তা ছাড়া ভিতরদিকে কলঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি আছে। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইতেই অন্দর হইতে একটা তীক্ষ্ণ স্ত্রীকণ্ঠের ছেদ-বিরামহীন আওয়াজ কনে আসিল। কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও শোকের লক্ষণ বিশেষ পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, বিমাতা বিলাপ করিতেছেন।

একটা বৃদ্ধ গোছের ভৃত্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'তুমি এ বাড়ির চাকর? যাও, ঐ বাড়ি থেকে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।'

চাকরিটা কিছু একটা করিবার সুযোগ পাইয়া 'যে আজ্ঞে বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। তখন হাবুলকে অগ্রবর্তী করিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

যাঁহার কণ্ঠস্বর বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম, তিনি উপরে উঠিবার সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একাকী অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিলেন, আমাদের পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙিলা;

তিনি উচ্চকিতভাবে আমাদের পানে চাহিলেন। দুইজন অপরিচিত লোককে হাবুলের সঙ্গে দেখিয়া তিনি মাথার উপর আঁচলটা টানিয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। আমি মুহূর্তের জন্য তাঁহার মুখখানা দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার মনে হইল, তাঁহার আরক্ত চোখের ভিতর একটা ত্রাস-মিশ্রিত বিরক্তির ছায়া দেখা দিয়াই অঞ্চলের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

হাবুল অস্ফুটস্বরে বলিল, 'আমার মা–"

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। রান্নাঘর কোনটা?'

হাবুল অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিল। অল্প-পরিসর চতুষ্কোণ উঠান ঘিরিয়া ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষ; তাহার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেইটি রান্নাঘর। পাশে একটি জলের কল, তাহা হইতে ক্ষীণ ধারায় জল পড়িয়া দ্বারের সম্মুখভাগ পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছে।

জুতা খুলিয়া আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, আলো-প্রবেশের কোনও পথ নাই। হাবুল দরজার পাশে হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিতেই একটা ধোঁয়াটে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বলিয়া উঠিল। তখন ঘরের অভ্যন্তরভাগ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম।

দ্বারের অপর দিকে দেয়ালে সংলগ্ন পাশাপাশি দুটি কয়লার উনান, তাহাতে ভাঙা পাথুরে কয়লা স্তূপীকৃত রহিয়াছে; কিন্তু আগুন নাই। এই অগ্নিহীন চুল্লীর সম্মুখে নতজানু হইয়া

একটি মেয়ে বসিয়া আছে-যেন বেদীপ্রান্তে উপাসনারত একটি স্ত্রীমূর্তি। মেয়েটির দেহ সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া আছে, মাথাও বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে; হাত দুটি লম্বিত দেখিয়া মনে হয় না যে, সে মৃত। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে গিয়া তাহার নাড়ি টিপিল।

তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, নাড়ি নাই। ব্যোমকেশ হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে মেয়েটির চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিল। প্রাণহীন দেহে মৃত্যুকাঠিন্য দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে–মুখ অল্প একটু উঠিল।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী, হাবুলের মত নয়। রং ফর্সা, মুখের গড়ন ধারালো, নীচের ঠোঁট অভিমানিনীর মত স্বভাবতই ঈষৎ স্ফুরিত। ষোলো বছর বয়সের অনুযায়ী দেহ-সৌষ্ঠবও বেশ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মাথার দীর্ঘ চুলগুলি বোধ হয় স্নানের পূর্বে বিনুনি খুলিয়া পিঠে ছাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই ভাবেই ছড়ানো আছে। পরিধানে একটি অর্ধ-মলিন গঙ্গা-যমুনা ডুরে; অলঙ্কারের মধ্যে হাতে তিনিগাছি করিয়া সোনার চুড়ি, কানে মিনা-করা হাল্কা ঝুমকা, গলায় একটি সরু হার।

ব্যোমকেশ নিকট হইতে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর দূর হইতে তাহার বসিবার ভঙ্গী ইত্যাদি সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য কয়েক পা সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া থাকিয়া সে আবার নিকটে ফিরিয়া আসিল; মেয়েটির ডান হাতখানি তুলিয়া করতল পরীক্ষা করিয়া দেখিল। করতলে

কয়লার কালি লাগিয়া আছে-সে নিজের হাতে উনানে কয়লা দিয়াছে, সহজেই অনুমান করা যায়। অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাব পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অঙ্গুলি দুটি সাবধানে পৃথক করিতেই একটি ক্ষুদ্র জিনিস খসিয়া মাটিতে পড়িল। ব্যোমকেশ সেটি মাটি হইতে তুলিয়া নিজের করতলে রাখিয়া আলোর দিকে পরীক্ষা করিল। আমিও ঝুঁকিয়া দেখিলাম—একটি দেশলাইকাঠির অতি ক্ষুদ্র দগ্ধাবশেষ, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া জ্বলিয়া আঙুল পর্যন্ত পৌঁছিলে যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু।

গভীর মনঃসংযোগে কাঠিটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ সেটা ফেলিয়া দিল, তারপর মেয়েটির বাঁ হাত তুলিয়া দেখিল। বাঁ হাতটি মুষ্টিবদ্ধ ছিল, মুঠি খুলিতেই একটি দেশলাইয়ের বাক্স দেখা গেল। ব্যোমকেশ বাক্সটি খুলিয়া দেখিল, কয়েকটি কাঠি রহিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'হুঁ। আমিও তাই প্রত্যাশা করেছিলুম। দেশলাই জ্বেলে উনুনে আগুন দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় মৃত্যু হয়েছে।'

অতঃপর ব্যোমকেশ মৃতদেহ ছাড়িয়া ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল; মেঝের উপর সিক্ত পদচিহ্ন শুকাইয়া অস্পষ্ট দাগ হইয়াছিল, সেগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, মৃত্যুকালে ঘরে আর কেউ ছিল না। পরে একজন স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকেছিলেন, তারপর হাবুল ঢুকেছিল।'

এই সময় বাহিরে শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'বোধ হয় ডাক্তার রুদ্র এলেন। হাবুল, তাঁকে নিয়ে এস।'

হাবুল বাহিরে গেল। আমি এই অবসরে ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু বুঝলে?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, 'কিছু না। কেবল এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়েটি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জানত না যে, মৃত্যু এত নিকট।'

ডাক্তার রুদ্রকে লইয়া হাবুল ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার রুদ্র বয়স্থ লোক; কলিকাতার একজন নামজাদা চিকিৎসক। কিন্তু অত্যন্ত রূঢ় ও কটুভাষী বলিয়া তাঁহার দুনাম ছিল। মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত; এমন কি মুমূর্ষ রোগীর ঘরেও তিনি এমন ব্যবহার করিতেন যে, তিনি না হইয়া অন্য কোনও ডাক্তার হইলে তাঁহার পেশা চলা কঠিন হইয়া পড়িত। একমাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি পসার-প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন; এছাড়া তাঁহার মধ্যে অন্য কোনও গুণ আজ পর্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই।

ডাক্তার রুদ্রের চেহারা হইতেও তাঁহার চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইত। নিকষ কৃষ্ণ গায়ের রং, ঘোড়ার মত লম্বা কদাকার মুখে রক্তবর্ণ দুটা চক্ষুর দৃষ্টি দুর্বিনীত আত্মম্ভরিতায় যেন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। অধরোষ্ঠের গঠনেও ঐ সার্বজনীন অবস্থা ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন, তখন মনে হইল, মূর্তিমান দম্ভ কোট-প্যান্টালুন ও জুতা সুদ্ধ ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাবুল নীরবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভগিনীর দেহ দেখাইয়া দিল। ডাক্তার রুদ্র স্বভাব-কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে? মারা গেছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই দেখুন।'

ডাক্তার রুদ্র ব্যোমকেশের দিকে দম্ভ-কষায় নেত্র তুলিয়া বলিলেন, 'আপনি কে?'

'আমি পারিবারিক বন্ধু।'

'ও!'–ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ডাক্তার রুদ্র হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি কে-দেবকুমারবাবুর মেয়ে?'

হাবুল ঘাড় নাড়িল।

ডাক্তার রুদ্রের উত্থিত-ভ্রূ-ললাটে ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ পাইল। তিনি মৃতদেহের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'এরই নাম রেখা?'

হাবুল আবার ঘাড় নাড়িল।

'কি হয়েছিল?'

'কিছু না–হঠাৎ–'

ডাক্তার রুদ্র তখন হাঁটু গাড়িয়ে রেখার পাশে বসিলেন; মুহূর্তের জন্য একবার নাড়িতে হাত দিলেন, একবার চোখের পাতা টানিয়া চক্ষু-তারকা দেখিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মারা গেছে। প্রায় দুঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে। Rigor mortis set in করেছে।' কথাগুলি তিনি এমন পরিতৃপ্তির সহিত বললেন—যেন অত্যন্ত সুসংবাদ শুনিবামাত্র শ্রোতারা খুশি হইয়া উঠিবে।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কিসে মৃত্যু হয়েছে, বলতে পারেন কি?'

'সেটা অটপ্সি না করে বলা অসম্ভব। আমি চললুম–আমার ভিজিট বত্রিশ টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। আর, পুলিসে খবর দেওয়া দরকার, মৃত্যু সন্দেহজনক।' বলিয়া ডাক্তার রুদ্র প্রস্থান করিলেন।

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিশে খবর পাঠানোই উচিত, নইলে আরও অনেক হাঙ্গামা হতে পারে। আমাদের থানার দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।'

এক টুকরা কাগজে তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ব্যোমকেশ চাকরের হাতে দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিল। তারপর বলিল, 'মৃতদেহ এখন নাড়াচাড়া করে কাজ নেই, পুলিস এসে যা হয় করবে।' দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া কহিল, 'হাবুল, একবার রেখার ঘরটা দেখতে গেলে ভাল হত।'

ভারী গলায় 'আসুন বলিয়া হাবুল আমাদিগকে উপরে লইয়া চলিল। প্রথম খানিকটা কান্নাকাটি করিবার পর সে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়ছিল; যে যাহা বলিতেছিল, কলের পুতুলের মত তাঁহাই পালন করিতেছিল।

দ্বিতলে গোটা তিনেক ঘর, তাহার সর্বশেষেরটি রেখার; বাকী দুইটি বোধ করি দেবকুমারবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর শয়নকক্ষ। রেখার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও পরিপাটীভাবে গোছানো। আসবাব বেশি নাই, যে কয়টি আছে, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এক ধারে একখানি ছোট খাটের উপর বিছানা; অপর দিকে জানালার ধারে লিখিবার টেবিল। পাশে ক্ষুদ্র সেলফে দুই সারি বাঙ্গালা বই সাজানো।

দেয়ালে ব্র্যাকেটের উপর একটা আয়না, তাহার পদমূলে চিরুণী, চুলের ফিতা, কাঁটা ইত্যাদি রহিয়াছে। ঘরটির সর্বত্র গৃহকর্মে সুনিপুণা ও শিক্ষিতা মেয়ের হাতের চিহ্ন যেন আঁকা রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ ঘরের এটা-ওটা নাড়িয়া একবার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, চুলের ফিতা ও কাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিল; তারপর জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। জানালাটা ঠিক গলির উপরেই; গলির অপর দিকে একটু পাশে ডাক্তার রুদ্রের প্রকাণ্ড বাড়ি ও ডাক্তারখানা। বাড়ির খোলা ছাদ জানালা দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর ফিরিয়া টেবিলের দেরাজ ধরিয়া টানিল।

দেরাজে চাবি ছিল না, টান দিতেই খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহাতে বিশেষ কিছু নাই; দু' একটা খাতা, চিঠি লেখার প্যাড, গন্ধদ্রব্যের শিশি, ছুচ-সূতা ইত্যাদি রহিয়াছে। একটা শিশি তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ দেখিল, ভিতরে কয়েকটা সাদা ট্যাবলয়েড রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'অ্যাসপিরিন। রেখা কি অ্যাসপিরিন খেত?

হাবুল বলিল, 'হ্যাঁ-মাঝে মাঝে তার মাথা ধরত—'

সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিছানায় শয়নের চিহ্ন বিদ্যমান, লেপটা এলোমেলোভাবে পায়ের দিকে পড়িয়া আছে, মাথার বালিশ মাথার চাপের দাগ। কিছুক্ষণের জন্য শ্মশান-বৈরাগ্যের মত একটা ভাব মনকে বিষণ্ন করিয়া দিল-এই তো

মানুষের জীবন-যাহার শয়নের দাগ এখনও মুখ্য ভূমিলাইয়া যায় নাই, সে প্রভাতে উঠিয়াই কোন অনন্তের পথে যাত্রা করিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই।

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে মাথার বালিশটা তুলিল; এক খণ্ড ফিকা সবুজ রঙের কাগজ বালিশের তলায় চাপা ছিল, বালিশ সরাইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্যোমকেশ সচকিতে কাগজখানা তুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, ভাঁজকরা চিঠির কাগজ। সে একবার একটু ইতস্তত করিল, তারপর চিঠির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

আমিও গলা বাড়াইয়া চিঠিখানি পড়িলাম। মেয়েলী ছাঁদের অক্ষরে তাহাতে লেখা ছিল—

নন্তুদা,

আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। তোমার বাবা দশ হাজার টাকা চান, অত টকা বাবা দিতে পারবেন না।

আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না, এ বোধ হয় তুমি জানো। কিন্তু এ বাড়িতে থাকাও আর অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমাকে একটু বিষ দিতে পার? তোমাদের ডাক্তারখানায় তো অনেক রকম বিষ পাওয়া যায়। দিও; যদি না দাও, অন্য যে-কোনও উপায়ে আমি মরব। তুমি তো জানো, আমার কথার নড়াচড় হয় না। ইতি–

তোমার রেখা।

চিঠিখানা পড়িয়ে ব্যোমকেশ নীরবে হাবুলের হাত দিল। হাবুল পড়িয়া আবার ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রু উদ্‌গলিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি জানতুম এই হবে, রেখা আত্মহত্যা করবে—'

'নস্তু কে?'

'নস্তুদা ডাক্তার রুদ্র'র ছেলে। রেখার সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। নস্তুদা বড় ভাল, কিন্তু ঐ চামারটা দশ হাজার টাকা চেয়ে বাবাকে রাগিয়ে দিলে—'

ব্যোমকেশ নিজের মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'কিন্তু—; যাক।' তারপর হাবুলের হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া স্নিগ্ধস্বরে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। হাবুল রুদ্ধস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশদা, নিজের বলতে আমার ঐ বোনটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মা নেই–বাবাও আমাদের কথা ভাববার সময় পান না–বলিয়া সে মুখে কাপড় দিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

যা হোক, ব্যোমকেশের স্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্যে কিছুক্ষণ পরে সে অনেকটা শান্ত হইল। তখন ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এখনই পুলিস আসবে। তার আগে তোমার মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

হাবুলের বিমাতা নিজের ঘরে ছিলেন। হাবুল গিয়া ব্যোমকেশের আবেদন জানাইল, তিনি আড়ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিপূর্বে তাঁহাকে এক নজর মাত্র দেখিয়াছিলাম, এখন আরও ভাল করিয়া দেখিলাম।

তাঁহার বয়স বোধ হয় সাতাশ-আটাশ বছর; রোগা লম্বা ধরনের চেহারা, রং বেশ ফস, মুখের গড়নও সুন্দর। কিন্তু তবু তাঁহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলা তো দূরের কথা, চলনসই বলিতেও দ্বিধা হয়। চোখের দৃষ্টিতে একটা স্থায়ী প্রখরতা ভ্রুযুগলের মধ্যে দুইটি ছেদরেখা টানিয়া দিয়াছে; পাৎলা সুগঠিত ঠোঁট এমনভাবে ঈষৎ বাঁকা হইয়া আছে, যেন সর্বদাই অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখিয়া শ্লেষ করিতেছে। তাঁহার অসন্তোষ-চিহ্নিত মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, বিবাহের পর হইতে ইনি এক দিনের জন্যও সুখী হন নাই। মানসিক উদারতার অভাবে সপত্নী-সন্তানদের কখনও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, নিজেরও সন্তান হয় নাই; তাই তাঁহার স্নেহহীন চিত্ত মরুভূমির মত উষর ও শুষ্ক রহিয়া গিয়াছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম–তাঁহার বোধহয় শুচিবাই আছে। তিনি যেরূপ ভঙ্গীতে দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি নিজেকে ও নিজের ঘরটিকে সর্বপ্রকার অশুদ্ধি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাছে আমরা তাঁহার ঘরে পদার্পণ করিয়া ঘরের নিষ্কলুষ পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিই, তিনি দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আমরা অবশ্য ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম না, বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আজ সকালে রেখার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

প্রত্যুত্তরে মহিলাটি একগঙ্গা কথা বলিয়া গেলেন। দেখিলাম, অন্যান্য নারীসুলভ সদগুণের মধ্যে বাচালতাও বাদ যায় নাই–একবার কথা কহিবার অবকাশ পাইলে আর থামিতে পারেন না। ব্যোমকেশের স্বল্পাক্ষর প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁহার মনের ও সংসারের অধিকাংশ কথাই বলিয়া ফেলিলেন। আজ সকালে ঝি আসে নাই দেখিয়া তিনি রেখাকে রান্নাঘর নিকাইয়া উনানে আগুন দিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য সপত্নী-সন্তানদের তিনি কখনও আঙুল নাড়িয়াও সংসারের কোনও কাজ করিতে বলেন না-নিজের গতির যতদিন আছে, নিজেই সব করেন। কিন্তু তবু সংসারের উন্নকুটি-চৌষট্টি কাজ তো আর একা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তাই তিনি রেখাকে উনান ধরাইতে বলিয়া স্বয়ং নিজের শয়নকক্ষের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান সারিয়া উপরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, রান্নাঘরে কি হইতেছে না হইতেছে, দেখেন নাই। তারপর কাপড় ছাড়িয়া চুল মুছিয়া দশবার ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়া নীচে গিয়া দেখেন—ঐ কাণ্ড। সপত্নী-সন্তানদের কোনও কথায় তিনি থাকেন না, অথচ এমনই তাঁহার দুর্দৈব যে, যত ঝঞ্ঝাট তাঁহাকেই পোহাইতে হয়। এখন যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলে হয়তো তাঁহাকেই দূষিবে, বিশেষত কতা ফিরিয়া আসিয়া যে কি মহামারী কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। একে তো। তিনি কর্তার চক্ষুঃশূল, তিনি মরিলেই কর্তা বাঁচেন।

বাক্যস্রোত কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ সকালে আপনি রেখাকে কি কোনও রূঢ় কথা বলেছিলেন?'

এবার মহিলাটি একবারে ঝাঁকিয়া উঠিলেন, 'রূঢ় কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না তেমন ভদ্রলোকের মেয়ে আমি নই। এ বাড়িতে ঢুকে অবধি সতীন-পো সতীন-ঝি নিয়ে ঘর করছি, কিন্তু কেউ বলুক দেখি যে, একটা কড়া কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। তবে আজ সকালে রেখাকে উনুন ধরাতে পাঠালুম, সে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে, 'দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি। না।'-বলে ঘরে ঢুকে ব্র্যাকেটের উপর থেকে দেশলাই নিলে। আমি তখন মেঝে মুছছিলুম, বললুম, 'বাসি কাপড় ঘরে ঢুকলে? এতবড় মেয়ে হয়েছ, এটুকু হুঁস নেই? দেশলাইয়ের দরকার ছিল, দোকান থেকে একটা আনিয়ে নিলেই পারতে।' এইটুকু বলেছি, এ ছাড়া আর একটি কথার আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো ঘাট মানছি।'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'অপরাধের কথা নয়; কিন্তু দেশলাই নিতে রেখা আপনার ঘরে এল কেন? আপনার ঘরেই কি দেশলাই থাকে?'

গৃহিণী বলিলেন, 'হ্যাঁ। রাত্তিরে আমি অন্ধকারে ঘুমতে পারি না, তেলের ল্যাম্প জেলে শুই–তাই ঘরে দেশলাই রাখতে হয়। ঐ ব্র্যাকেটের উপর ল্যাম্প আর দেশলাই থাকে। সবাই জানে, রেখাও জানত।'

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, খাটের শিয়রের দিকে দেয়ালে একটি ক্ষুদ্র কাঠের ব্র্যাকেট, তাহার উপর ছোট একটি ল্যাম্প রহিয়াছে। ঘরের অন্যান্য অংশও এই সুযোগে দেখিয়া লইলাম। পরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে ঘরের আসবাবপত্র যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে।

এমন কি দেয়ালে লম্বিত মা কালীর ছবিখানিও যেন ঘরের শুচিন্তা-ভঙ্গের ভয়ে সন্ত্রস্তভাবে জিভ বাহির করিয়া আছেন।

চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে ব্যোমকেশ বলিল, 'ও—তাহলে এই সময় রেখাকে আপনি শেষ দেখেন? তারপর আর তাকে জীবিত দেখেননি?'

'না'–বলিয়া গৃহিণী বোধ করি আবার একপ্রস্থ বক্তৃতা শুরু করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নীচে হইতে চাকর জানাইল যে, দারোগাবাবু আসিয়াছেন।

আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

দারোগা বীরেনবাবুর সহিত ব্যোমকেশের ঘনিষ্ঠতা ছিল, দু'জনেই দুজনের কদর বুঝিতেন। বীরেনবাবু মধ্যবয়স্ক লোক, হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা-বিচক্ষণ ও চতুর কর্মচারী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। বিশেষত তাঁহার মধ্যে পুলিস-সুলভ আত্মম্ভরিতা বা অন্যের কৃতিত্ব লঘু করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। কয়েকটা জটিল ব্যাপারে ব্যোমকেশকে তাঁহার সাহায্য লইতেও দেখিয়াছি। শহরের নিম্নশ্রেণীর গাঁটকোটা ও গুণ্ডাদের চালচলন সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ অভিজ্ঞতা ছিল।

ব্যোমকেশের সহিত মুখোমুখি হইতেই বীরেনবাবু বলিলেন, 'কি খবর, ব্যোমকেশবাবু! গুরুতর কিছু না কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি নিজেই তার বিচার করুন।' বলিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া চলিল।

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য রওনা করিয়া দিয়া, দেবকুমারবাবুকে 'তার' পাঠাইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিতে বেলা দুটা বাজিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া আমরা যখন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উঠিলাম, তখন শীতের বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বিমনা ও নীরব হইয়া রহিল। আমিও মনের মধ্যে অনুতাপের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। মস্তিষ্কের যে খোরাকের জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়ছিলাম, তাহা এমন নির্মমভাবে দেখা দিবে, কে ভাবিয়াছিল? বেচারা হাবুলের কথা বার বার মনে পড়িয়া মনটা ব্যথা-পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, ব্যোমকেশ দৃষ্টিহীন চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া নীরব হইয়াই রহিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আত্মহত্যা তাহলে? কি বল?'

ব্যোমকেশ চমকিয়া উঠিল, 'অ্যাঁ! ও—রেখার কথা বলছ? তোমার কি মনে হয়?'

যদিও মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিল না, তবু বলিলাম, 'আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? চিঠি থেকে তো ওর অভিপ্রায় বেশ বোঝাই যাচ্ছে।'

'তা যাচ্ছে। কি উপায়ে আত্মহত্যা করেছে, তুমি মনে করা?'

'বিষ খেয়ে। সে কথাও তো চিঠিতে—'

'আছে। কিন্তু বিষ পাবার আগেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কি করে হতে পারে, আমি ভেবে পাচ্ছি না। চিঠিতে রেখা বিষ চেয়েছিল, কিন্তু চিঠি যখন যথাস্থানে পৌঁছায়নি লেখিকার বালিশের তলাতেই থেকে গিয়েছিল, তখন বিষ এল কোত্থেকে?'

আমি বলিলাম, 'চিঠিতে আছে, সে বিষ না পেলে অন্য যে কোনও উপায়ে—'

'কিন্তু চিঠি পাঠাবার আগেই সে অন্য উপায় অবলম্বন করবে, এটা তুমি সম্ভব মনে করা?'

আমি নিরুত্তর হইলাম।

কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'তা ছাড়া উনুন জ্বালতে জ্বালতে কেউ আত্মহত্যা করে না। রেখার মৃত্যু এসেছিল। অকস্মাৎ-নির্মেঘ আকাশ থেকে বিদ্যুতের মত। এত ক্ষিপ্ত এমন অমোঘ এই মৃত্যুবাণ যে, সে একটু নড়বার অবকাশ পায়নি, দেশলাইয়ের কাঠি হাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'কি করে এমন মৃত্যু সম্ভব হল?'

'সেইটেই বুঝতে পারছি না। জানি তো বিষের মধ্যে এক হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড ছাড়া এত ভয়ঙ্কর শক্তি আর কারুর নেই। কিন্তু—' ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা চিন্তার মধ্যে নির্বাণ লাভ করিল।

আমি একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, 'আমি ডাক্তারি সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিন্তু হঠাৎ হার্টফেল করে মৃত্যু সম্ভব নয় কি?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ঐ সম্ভাবনাটাই দেখেছি ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। রেখা মাথাধরার জন্যে অ্যাসপিরিন খেত, হয়তো ভেতরে ভেতরে হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল-কিন্তু না, কোথায় যেন বেধে যাচ্ছে, হার্টফেলের সম্ভাবনাটা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারছি না, যদিও যুক্তি-প্রমাণ সব ঐ দিকেই নির্দেশ করছে। ' ব্যোমকেশ অপ্রতিভভাবে হাসিল—'বুদ্ধির সঙ্গে মনের আপোস করতে পারছি না; কেবলই মনে হচ্ছে , মৃত্যুটা সহজ নয়, সাধারণ নয়, কোথায় এর একটা মস্ত গলদ আছে। কিন্তু যাক, এখন মিথ্যে মাথা গরম করে লাভ নেই। কাল ডাক্তারের রিপোর্ট পেলেই সব বোঝা যাবে।'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশ উঠিয়া আলো জ্বলিল। এই সময় বহির্দ্বারে আস্তে আস্তে টোকা মারার শব্দ হইল। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যায় নাই, ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'কে? ভেতরে এস!'

একটি অপরিচিত যুবক নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, সুশ্রী চেহারা–কিন্তু শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ট্র্যাজেডির ছায়া পড়িয়াছে। পায়ে রবার-সোল জুতা ছিল বলিয়া তাহার

পদধ্বনি শুনিতে পাই নাই। সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, 'আমার নাম মন্মথনাথ রুদ্র—'

ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহার। আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল, 'আপনিই নন্তুবাবু? আসুন।'—বলিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া দিল।

চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া যুবক থামিয়া থামিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

ব্যোমকেশ টেবিলের সম্মুখে বসিয়া বলিল, 'সম্প্রতি আপনার নাম জানবার সুযোগ হয়েছে। আপনি রেখার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে চান?'

যুবকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া গেল, সে বলিল, 'হ্যাঁ। কি করে তার মৃত্যু হল, ব্যোমকেশবাবু?'

'তা এখনও জানা যায়নি।'

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু ব্যোমকেশের মুখের উপর রাখিয়া মন্মথ বলিল, 'আপনার কি সন্দেহ সে আত্মহত্যা করেছে?'

'সম্ভব নয়।'

‘তবে কি কেউ তাকে–’

‘এখনও জোর করে কিছু বলা যায় না।’

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মন্মথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, ‘আপনারা হয়তো শুনেছেন, রেখার সঙ্গে আমার—‘

‘শুনেছি।’

মন্মথ এতক্ষণ জোর করিয়া সংযম রক্ষা করিতেছিল, এবার ভাঙিয়া পড়িল, অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, ‘ছেলেবেলা থেকে ভালবাসতুম; যখন রেখার ছ’বছর বয়স, আমি ওদের বাড়িতে খেলা করতে যেতুম, তখন থেকে। তারপর যখন বিয়ের সম্বন্ধ হল, তখন বাবা এমন এক শর্ত দিলেন যে, বিয়ে ভেঙে গেল। তবু আমি ঠিক করেছিলুম, বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করব। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। বাবা বললেন বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন। তবু আমি—‘

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘বাবার সঙ্গে আপনার কখন ঝগড়া হয়েছিল?’

‘কাল দুপুরবেলা। আমি বলেছিলুম, রেখাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না। তখন কে জানত যে রেখা—কিন্তু কেন এমন হল, ব্যোমকেশবাবু? রেখাকে প্রাণে মেরে কার কি লাভ হল?’

ব্যোমকেশ একটা পেন্সিল লইয়া টেবিলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছিল, মুখ না তুলিয়া বলিল, 'আপনার বাবার কিছু লাভ হতে পারে।'

মন্মথ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, 'বাবা! না না–এ আপনি কি বলছেন? বাবা—'

ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্রে শূন্যের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, মন্মথ আর কোনও কথা না বলিয়া স্খলিত পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সে গাঢ় মনঃসংযোগে টেবিলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছে।

পরদিন সকালবেলা

পরদিন সকালবেলাটা ডাক্তারের রিপোর্টের প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। কিন্তু রিপোর্ট আসিল না। ব্যোমকেশ ফোন করিয়া থানার খবর লইল, কিন্তু সেখানে কোনও খবর পাওয়া গেল না।

বৈকালে বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটার সময় দেবকুমারবাবু আসিলেন। আলাপ না থাকিলেও তাঁহার সহিত মুখচেনা ছিল; আমরা খাতির করিয়া তাঁহাকে বসাইলাম। তিনি হাবুলের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র দিল্লী ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিলেন, আজ দ্বিপ্রহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

তাঁহার বয়স চল্লিশ কি একচল্লিশ বৎসর; কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও বর্ষীয়ান মনে হয়। মোটাসোটা দেহ, মাথায় টাক, চোখে পুরু কাচের চশমা। তিনি স্বভাবত একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়-অর্থাৎ বাহিরের জগতের চেয়ে অন্তলোকেই বেশি বাস করেন। তাঁহার গলাবন্ধ কোট ও গোল চশমা-পরিহিত পেচকের ন্যায় চেহারা কলিকাতার ছাত্রমহলে কাহারও অপরিচিত ছিল না, প্রতিবেশী বলিয়া আমিও পূর্বে কয়েকবার দেখিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিলাম, তাঁহার চেহারা কেমন যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে। চোখের কোলে গভীর কালির দাগ, গালের মাংস চুপসিয়া গিয়াছে, পূর্বের সেই পরিপুষ্ট ভাব আর নাই।

চশমার কাচের ভিতর দিয়া আমার পানে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু?'

আমি ব্যোমকেশকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ও।'– বলিয়া হাতের লাঠিটা টেবিলের উপর রাখিলেন।

ব্যোমকেশ অস্ফুটস্বরে মামুলি দুএকটা সহানুভূতির কথা বলিল; দেবকুমারবাবু বোধ হয় তাহা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষু একবার ঘরের চারিদিক পরিভ্রমণ করিল, তারপর তিনি ক্লান্তিশিথিল স্বরে বলিলেন, 'কাল বেলা দশটায় দিল্লী থেকে বেরিয়ে আজ আড়াইটার সময় এসে পৌঁছেছি। প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ট্রেনে—'

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম; দৈহিক শ্রান্তির পরিচয় তাঁহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল। দেবকুমার অতঃপর ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'হাবুলের মুখে আপনার কথা শুনেছি–বিপদের সময় সাহায্য করেছেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সে কি কথা, যদি একটু সাহায্য করতে পেরে থাকি, সে তো প্রতিবেশীর কর্তব্য।'

'তা বটে; কিন্তু আপনি কাজের লোক–' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছিল মেয়েটার? কিছু বুঝতে পেরেছেন কি? বাড়িতে ভাল করে কেউ কিছু বলতে পারলে না।'

ব্যোমকেশ তখন যতখানি দেখিয়াছিল ও বুঝিয়াছিল, দেবকুমারবাবুকে বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে দেবকুমারবাবু অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে সিগার বাহির করিলেন, সিগার মুখে ধরিয়া তারপর আবার কি মনে করিয়া সেটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম, দেখিলাম, ব্যোমকেশের কথা শুনিতে শুনিতে তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, স্নায়ুবিক উত্তেজনার বশে তাঁহার অস্থির হাত দুটা যে কি করিতেছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই। একবার তিনি চশমা খুলিয়া বড় বড় চোখ দু'টা নিষ্পলকভাবে প্রায় দু'মিনিট আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তারপর আবার চশমা পরিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশের বিবরণ শেষ হইলে দেবকুমারবাবু অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'হুঁ, ঐ ডাক্তার রুদ্রটা আমার বাড়িতে ঢুকেছিল! চামার! চণ্ডাল! টাকার জন্য ও পারে না, এমন কাজ নেই। একটা জীবন্ত পিশাচ!' উত্তেজনার বশে তিনি লাঠিটা মুঠি করিয়া ধরিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখ হঠাৎ ভীষণ হিংস্রভাব ধারণ করিল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কিন্তু আবার তাঁহার মুখ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমাদের চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয় মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, 'আমি যাই। ব্যোমকেশবাবু, আর একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিলেন; তারপর ফিরিয়া বলিলেন, 'আমার পয়সা থাকলে এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আপনাকে নিযুক্ত করতুম। কিন্তু আমি গরীব–আমার পয়সা নেই।' ব্যোমকেশ কি একটা বলিতে চাহিলে তিনি লাঠি নাড়িয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'বিনা পারিশ্রমিকে আমি কারুর সাহায্য গ্রহণ করতে পারব। না। পুলিস অনুসন্ধান করছে, তারাই যা পারে করুক। আর, অনুসন্ধান করবার আছেই বা কি? হাজার অনুসন্ধান করলেও আমার মেয়ে তো আর আমি ফিরিয়ে পাব না।' বলিয়া কোনও প্রকার অভিবাদন না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই অদ্ভুত মনুষ্যটি চলিয়া যাইবার পর দীর্ঘকাল আমরা হতবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বোমকেশ বলিল, 'একটা ভ্রম সংশোধন হল। আমরা ধারণা হয়েছিল, দেবকুমারবাবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন না–সেটা ভুল। অন্তত মেয়েকে তিনি খুব বেশি ভালবাসেন।'

সিগারটা দেবকুমারবাবু ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আশ্চর্য অন্যমনস্ক লোক।' বলিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'ডাক্তার রুদ্র'র ওপর ভয়ঙ্কর রাগ দেখলুম।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

সন্ধ্যার পর দারোগা বীরেনবাবু স্বয়ং ডাক্তারের রিপোর্ট লইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'রিপোর্ট বড় disappointing, বারবার পরীক্ষা করেও মৃত্যুর কারণ ধরতে পারা যায়নি।'

রিপোর্ট পড়িয়া দেখিলাম, ডাক্তার লিখিয়াছেন, দেহের কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই; শরীরের অভ্যন্তরেও কোনও বিষ পাওয়া যায় নাই। হৃদযন্ত্র সবল ও স্বাভাবিক, সুতরাং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য মৃত্যু হয় নাই। যতদূর বুঝতে পারা যায়, অকস্মাৎ স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত ঘটিল, তাহা বলিতে ডাক্তার অক্ষম। এরূপ অদ্ভুত লক্ষণহীন মৃত্যু তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই।

ব্যোমকেশ কাগজখানা হাতে লইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিল।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'এ কেস অবশ্য করোনারের কোর্টে যাবে; সেখানে 'অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু' রায় বেরুবে। তারপর আমরা—অর্থাৎ পুলিস-ইচ্ছে করলে অনুসন্ধান চালাতে পারি, আবার না-ও চালাতে পারি। ব্যোমকেশবাবু, আপনি কি বলেন? এই রিপোর্টের পর অনুসন্ধান করলে কোনও ফল হবে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফল হবে কি না বলতে পারি না; কিন্তু অনুসন্ধান চালানো উচিত।'

বীরেনবাবু উৎসুকভাবে বলিলেন, 'কেন বলুন দেখি? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?'

'ঠিক যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সন্দেহ করি, তা নয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যে গোলমাল আছে।'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, দেবকুমারবাবুর স্ত্রীকে আপনার কি রকম মনে হল?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'দেখুন, আমার মনে হয়, ও-পথে গেলে হবে না। এ মৃত্যু-রহস্যের জট ছাড়াতে হলে সর্বপ্রথম জানতে হবে–কি উপায়ে মৃত্যু হয়েছিল। এটা যতক্ষণ না জানতে পারছেন, ততক্ষণ একে ওকে সন্দেহ করে কোনও ফল হবে না। অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মেয়েটির মৃত্যুর সময় তাঁর সৎমা আর সহোদর ভাই ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাই বলে আসল জিনিসটিকে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিলে চলবে না।'

'কিন্তু ডাক্তার যে-কথা বলতে পারছে না–'

ডাক্তার কেবল শব পরীক্ষা করেছেন, আমরা শব ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখেছি। সুতরাং ডাক্তার যা পারেননি আমরাও তা পারব না, এমন কোনও কথা নেই।'

দ্বিধাপূর্ণস্বরে বীরেনবাবু বলিলেন, 'তা বটে—কিন্তু; যা হোক, আপনি তো দেবকুমারবাবুর পক্ষ থেকে গোড়া থেকেই আছেন, শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় থাকবেন-দুজনে পরামর্শ করে চলা যাবে।'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘উহু। এই খানিক আগে দেবকুমারবাবু এসেছিলেন–তিনি আমাকে বরখাস্ত করে গেছেন।’

বিস্মিত বীরেনবাবু বলিলেন, ‘সে কি?’

‘হ্যাঁ। আমার অবৈতনিক সাহায্য তিনি চান না।–আর টাকা দিয়ে আমাকে নিয়োগ করতে তিনি অক্ষম।’

‘বটে। তিনি অক্ষম কিসে? তিনি তো মোটা মাইনের চাকরি করেন, সাত আটশ’ টাকা মাইনে পান শুনেছি।’

‘তা হবে,’

বীরেনবাবুর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, ‘হুঁ, দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবার কি কারণ থাকতে পারে? তিনি কাউকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন না তো?’

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। দেবকুমারবাবু অপরাধীকে আড়াল করিবার জন্য কৌশলে ব্যোমকেশের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এ কথা শুনিতে যেমন অদ্ভুত, তেমনিই হাস্যকর।

বীরেনবাবু ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, ‘হাসছেন যে?’

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, ‘আপনি দেবকুমারবাবুকে দেখেছেন?’

‘না।‘

‘তাকে দেখলেই বুঝবেন, কেন হাসছি।’

অতঃপর বীরেনবাবু উঠিলেন। বিদায়কালে ব্যোমকেশকে বলিলেন, ‘আমি এ ব্যাপারের তল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখব, যদি কিনারা করতে পারি। —আপনি কিন্তু ছাড়া পাবেন না। দেবকুমারবাবু আপনাকে বরখাস্ত করেছেন বটে, কিন্তু দরকার হলে আমি আপনার কাছে আসব মনে রাখবেন।’

ব্যোমকেশ খুশি হইয়া বলিল, ‘সে তো খুব ভাল কথা। আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব। হাবুলের সম্পর্কে এ ব্যাপারে আমার একটা ব্যক্তিগত আকর্ষণও রয়েছে।’

বীরেনবাবু বলিলেন, ‘বেশ বেশ। আচ্ছা, উপস্থিত কোন পথে চললে ভাল হয়, কিছু ইঙ্গিত দিতে পারেন কি? যা হোক একটা সূত্র ধরে কাজ আরম্ভ করতে হবে তো।’

ব্যোমকেশ, ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, ‘ডাক্তার রুদ্র’র দিক থেকে কাজ আরম্ভ করুন; এ গোলক-ধাঁধার সত্যিকার পথ হয়তো ঐ দিকেই আছে।’

বীরেনবাবু চকিতভাবে চাহিলেন, ‘ও-আচ্ছা—’

তিনি নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর পাঁচ ছয় দিন

ইহার পর পাঁচ ছয় দিন একটানা ঘটনাহীনভাবে কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ আবার যেন বিমাইয়া পড়িল। সকালে কাগজ পড়া এবং বৈকালে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষু শূন্যে মেলিয়া থাকা ছাড়া তাহার আর কাজ রহিল না।

বীরেনবাবুও এ কয়দিনের মধ্যে দেখা দিলেন না, তাই তাঁহার তদন্ত কতদূর অগ্রসর হইল, জানিতে পারিলাম না। আগন্তুকের মধ্যে কেবল হাবুল একবার করিয়া আসিত। সে আসিলে ব্যোমকেশ নিজের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া নানাবিধ আলোচনায় তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু হাবুলের মনে যেন একটা বিমর্ষ অবসন্নতা স্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে নৈরাশ্যপূর্ণ দীপ্তিহীন চোখে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত, তারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

বাড়িতে কি হইতেছে না হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেও সে ভালরূপ জবাব দিতে পারিত না। বিমাতার রসনা নরম না হইয়া আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথার ভঙ্গীতে ইহার আভাস পাইতাম। শেষদিন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘বাবা আজ রাত্রে পাটনা যাচ্ছেন; সেখানে য়ুনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে হবে।’ বুঝিলাম, শোকের উপর অহর্নিশি কথার কচকচি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পলায়ন করিতেছেন। এই নিলিপ্তিস্বভাব বৈজ্ঞানিকের পারিবারিক অশান্তির কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল।

সেদিন হাবুল প্রস্থান করিবার পর বীরেনবাবু আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। যা হোক, ব্যোমকেশ তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইল।

আমাদের বৈকালিক চায়ের সময় হইয়াছিল, অচিরাৎ চা আসিয়া পৌঁছিল। তখন ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর-খবর কিছু আছে?'

পেয়ালায় চুমুক দিয়া বিমর্ষভাবে বীরেনবাবু বলিলেন, 'কোনও দিকেই কিছু সুবিধা হচ্ছে না। যেদিকে হাত বাড়াচ্ছি কিছু ধরতে ছুঁতে পারছি না, প্রমাণ পাওয়া তো দূরের কথা, একটা সন্দেহের ইশারা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ, আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, এর ভেতর একটা গভীর রহস্য লুকোনো রয়েছে; যতই প্রতিপদে ব্যর্থ হচ্ছি, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নূতন কিছু জানতে পেরেছেন?'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'আমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি অবশ্য রিপোর্টের বাইরে যেতে রাজী নন, তবু মনে হল, তাঁর একটা থিয়োরি আছে। তিনি মনে করেন, কোনও অজ্ঞাত বিষের বাষ্প নাকে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি খুব অস্পষ্ট আবছায়াভাবে কথাটা বললেন বটে, তবু মনে হল, তাঁর ঐ বিশ্বাস।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, "উনুন ধরাবার সময় মৃত্যু হয়েছিল, এ কথা ডাক্তারকে বলেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। আর এ দিকে? ডাক্তার রুদ্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। যতদূর জানতে পারলুম, লোকটা নির্জলা পাষণ্ড আর অর্থাপিশাচ। কয়েকজন ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর উপর নিজের আবিষ্কৃত ইনজেকশান পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের সাবাড় করেছে, এ গুজবও শুনেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান ব্যাপারে তাকে খুনের আসামী করা যায় না। দেবকুমারবাবুর মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের সম্বন্ধ হয়েছিল, এ খবরও ঠিক। লোকটা দশ হাজার টাকা বরপণ দাবি করেছিল। দেবকুমারবাবুর অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, কাজেই তাঁকে সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হল। ডাক্তার রুদ্র'র ছেলেটা কিন্তু ভদ্রলোক। বাপের সঙ্গে এই নিয়ে তার ভীষণ ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এ বাড়িতে এই কাণ্ড–মেয়েটি হঠাৎ মারা গেল। তারপর ছোকরাটি শুনলুম বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে; তার বিশ্বাস, তার বাপাই প্রকারান্তরে মেয়েটির মৃত্যুর কারণ।'

মন্মথ যে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ নূতন বটে, কিন্তু আর সব কথাই আমরা পূর্ব হইতে জনিতাম। তাই পুরাতন কথা শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ একটু

অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়ছিল। বীরেনবাবু থামিলে সে প্রশ্ন করিল, 'দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন বলেছিলেন, করেছিলেন না কি?'

'করেছিলুম। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ধারকার্জ নেই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করা তাঁর অসাধ্য। লোকটি বোধ হয় বেহিসাবী, সাংসারিক বুদ্ধি কম। কলেজ থেকে বর্তমানে তিনি আটশ' টাকা মাইনে পান। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই আটশ' টাকার অধিকাংশই যায় তার বীমা কোম্পানির পেটে। পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করিয়েছেন, তাও এত বেশি বয়সে যে প্রিমিয়াম দিয়ে হাতে বড় কিছু থাকে না।'

ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে বলিল, 'পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স! নিজের নামে করেছেন?'

'শুধু নিজের নামে নয়—জয়েন্ট পলিসি, নিজের আর স্ত্রী নামে। মাত্র এক বছর হল পলিসি নিয়েছেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী–তিনি মারা গেলে পাছে বিধবাকে পথে দাঁড়াতে হয়, এই জন্যেই বোধ হয়। দুজনে একসঙ্গে বীমা করিয়েছেন। এ টাকায় উত্তরাধিকারীদের দাবি থাকবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আর কিছু?'

বীরেনবাবু বলিলেন, ‘আর কি? দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুলের পিছনেও লোক লাগিয়েছিলুম–যদি কিছু জানতে পারা যায়। সে ছোকরা কেমন যেন পাগলাটে ধরনের, কলেজে বড় একটা যায় না, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কখনও পার্কে চুপ করে বসে থাকে। আপনার কাছেও রোজ একবার করে আসে, জানতে পেরেছি।’

এই সময় হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশের সে শৈথিল্য আর নাই, সে যেন অন্তরে-বাহিরে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দিন পরে তাহার চোখে সেই চাপা উত্তেজনার প্রখর দৃষ্টি দেখিতে পাইলাম। কিছু না বুঝিয়াও আমার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ কিন্তু বাহিরে কোনও উত্তেজনা প্রকাশ করিল না, পূর্ববৎ বিরসস্বরে বলিল, ‘হাবুলকে বাদ দিতে পারেন। উঠছেন না কি? থানাতেই থাকবেন তো? আচ্ছা যদি দরকার হয়, ফোনে খবর নেব।’

বীরেনবাবু একটু অবাক হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ পিছনে হাত দিয়া ঘরময় পায়চারি করিল; দেখিলাম, তাহার চোখে সেই-পুরাতন আলো জ্বলিতেছে। বীরেনবাবুকে সে হঠাৎ এমনভাবে বিদায় দিল কেন, জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি। এমন সময় সে চেয়ারের পিঠ হইতে শালখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, ‘চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বদ্ধ ঘরে বসে মাথাটা গরম বোধ হচ্ছে।’

দুজনে বাহির হইলাম। অকারণে বাড়ির বাহির হইতে ব্যোমকেশের একটা মজ্জাগত বিমুখতা ছিল; কাজ না থাকিলে সে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে

ভালবাসিত। আমিও তাহার সঙ্গদোষে কুনো হইয়া পড়িয়ছিলাম, একাকী কোথাও যাইবার অভ্যাসও ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাই আজ তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ফাঁকা জায়গায় বিশুদ্ধ বাতাস কামনা করিতেছে দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিলাম।

পথে চলিতে চলিতে কিন্তু খুশির ভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। জনসঙ্কুল পথে ব্যোমকেশ এমনই বাহ্যজ্ঞানহীন উদভ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল যে, ভয় হইল এখনই হয়তো একটা কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। আমি তাহাকে সামলাইয়া লইয়া চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অপ্রশমিত বেগে ইহাকে উহাকে ধাক্কা দিয়া, একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পা মাড়াইয়া দিয়া কয়েক মুহূর্ত পরে পুস্তকহস্তা এক তরুণীকে ঠেলা দিয়া দৃকপাত না করিয়া জগন্নাথের অপ্রতিহত রথের মত অগ্রসর হইয়া চলিল। বাস্তবিক, এতটা আত্মবিস্মৃত তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। তাহার মন যে অকস্মাৎ শিকারের সন্ধান পাইয়া বাহেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হারাইয়া ছুটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতেছিলাম বটে, কিন্তু তাহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন পথচারী তাহা বুঝিবে কেন?

ভর্ৎসনা-ভ্রূকুটির স্রোত পিছনে ফেলিয়া কোনক্রমে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। হাস্য-আলাপরত ছাত্রদের আবর্তমান জনতায় স্থানটি ঘূর্ণিচক্রের মত পাক খাইতেছে। আমি আর দ্বিধা না করিয়া ব্যোমকেশের হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। এখানে আর যাহাই হউক, বৃদ্ধ এবং তরুণীকে বিমর্দিত করিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অশিষ্টতা যদি কিছু ঘটিয়া যায়, ফাঁড়াটা সহজেই কাটিয়া যাইবে। আমাদের দেশের ছাত্ররা স্বভাবত কলহপ্রিয় নয়।

পুকুরকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি জনপ্রবাহ বিপরীত মুখে ঘুরিতেছে; আমরা একটি প্রবাহে মিশিয়া গেলাম, সংঘাতের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া গেল। ব্যোমকেশ তখনও স্থানকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, তাহার ললাট একাগ্রচিন্তার সঙ্কোচনে ভ্রূকুটিবন্ধুর; কাঁধের শাল মাঝে মাঝে স্থলিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, বীরেনবাবুর কথার মধ্যে এমন কি ছিল, যাহা ব্যোমকেশের নিষ্ক্রিয় মনকে অকস্মাৎ পাঞ্জাব মেলের এঞ্জিনের মত সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে? তবে কি রেখার মৃত্যু-সমস্যার সমাধান আসন্ন?

সমাধান যে কত আসন্ন, তখনও তাঁহা বুঝিতে পারি নাই।

আধা ঘণ্টা এইভাবে পরিভ্রমণ করিবার পর ব্যোমকেশের বাহ্য-চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল; সে সহজ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইল। বলিল, ‘আজ দেবকুমারবাবু পাটনা যাবেন–না?’

আমি ঘাড় নাড়িলাম। ‘তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না—‘ ব্যোমকেশ সম্মুখদিকে তাকাইয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ক্ষিপ্রাচরণে অগ্রসর হইয়া গেল! দেখিলাম, এক কোণে একখানি বেঞ্চি ঘিরিয়া অনেক ছেলে জড়ো হইয়াছে এবং উত্তেজিতভাবে কথা বলিতেছে। ভিড়ের বাহিরে যাহারা ছিল, তাহারা গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল অসাধারণ কিছু ঘটিয়াছে।

সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

ছেলেটি বলিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ হয়, কেউ হঠাৎ বেঞ্চে বসে বসে মারা গেছে।'

ব্যোমকেশ ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, আমিও তাহার পশ্চাতে রহিলাম। বেঞ্চির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি ছোকরা ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে–যেন বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, পা সম্মুখদিকে প্রসারিত। অধরোষ্ঠ হইতে একটি সিগারেট বুলিতেছে–সিগারেটে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতের মধ্যে একটি দেশলাইয়ের বাক্স।

একটি মেডিক্যাল ছাত্র নাড়ি ধরিয়া দেখিতেছিল, বলিল, 'নাড়ি নেই–মারা গেছে।'

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ভিড়ের মধ্যে ভাল দেখা যাইতেছিল না। ব্যোমকেশ চিবুক ধরিয়া মৃতের আনমিত মুখ তুলিয়াই যেন বিদ্যুদাহতের মত ছাড়িয়া দিল!

আমারও বুকে হাতুড়ির মত একটা প্রবল আঘাত লাগিল; দেখিলাম—আমাদের হাবুল।

পুলিস আসিয়া পৌঁছতে বিলম্ব হইল না

পুলিস আসিয়া পৌঁছতে বিলম্ব হইল না। আমরা দেবকুমারবাবুর ঠিকানা পুলিসকে জানাইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

তখন রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিতে ফিরিতে ব্যোমকেশ কয়েকবার যেন ভয়ার্ত শ্বাস-সংহত স্বরে বলিল, 'উঃ! নিয়তির কি নির্মম প্রতিশোধ! কি নিদারুণ পরিহাস!'

আমার মাথার ভিতর বুদ্ধিবৃত্তি যেন স্তম্ভিত নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল; তবু অসীম অনুশোচনার সঙ্গে কেবল এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল—পরলোক যদি থাকে, তবে যাহার মৃত্যুতে হাবুল এত কাতর হইয়াছিল সেই পরম স্নেহাস্পদ ভগিনীর সহিত তাহার এতক্ষণে মিলন হইয়াছে।

বাসায় পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ নিজের লাইব্রেরি-ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। শুনিতে পাইলাম, সে টেলিফোনে কথা বলিতেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্লান্তস্বরে পুটরামকে চা তৈয়ার করিতে বলিল, তারপর বুকে ঘাড় গুজিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যে ট্র্যাজেডির

শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িতে আর দেরি নাই, তাহার সম্বন্ধে বৃথা প্রশ্ন করিয়া আমি আর তাহাকে বিরক্ত করিলাম না।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বীরেনবাবু আসিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওয়ারেন্ট এনেছেন?'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িলেন।

তখন আবার আমরা বাহির হইলাম।

দেবকুমারবাবুর বাসায় আসিতে তিন চার মিনিট লাগিল। দেখিলাম, বাড়ি নিস্তব্ধ, উপরের ঘরগুলির জানালায় আলো নাই, কেবল নীচে বসিবার ঘরে বাতি জ্বলিতেছে।

বীরেনবাবু কড়া নাড়িলেন, কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল না। তখন তিনি দ্বার ঠেলিলেন, ভেজানো দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাহিরের ক্ষুদ্র ঘরটিতে তক্তপোশ পাতা, তাহার উপর দেবকুমারবাবু নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া আমাদের পানে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর তাঁহার মুখে একটা তিক্ত হাসি দেখা দিল, তিনি মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'সকলি গরল ভেল–'

বীরেনবাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'দেবকুমারবাবু, আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে।'

দেবকুমারবাবুর যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি দারোগাবাবুর পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আপনারা এসেছেন-ভালই হল। আমি নিজেই থানায় যাচ্ছিলুম—' দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'হাতকড়া লাগান।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'তার দরকার নেই। কোন অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল শুনুন— বলিয়া অভিযোগ পড়িয়া শুনাইবার উপক্রম করিলেন।

দেবকুমারবাবু কিন্তু ইতিমধ্যে আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন; পকেটে হাত দিয়া তিনি যেন কি খুঁজতে খুঁজতে নিজ মনে বলিলেন, 'নিয়তি! নইলে হাবুলও ঐ বাক্স থেকেই দেশলায়ের কাঠি বার করতে গেল কেন? কি ভেবেছিলুম, কি হল! ভেবেছিলুম, রেখার ভাল বিয়ে দেব, নিজের একটা বড় ল্যাবরেটরি করব, হাবুলকে বিলেত পাঠাব–' পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া তিনি মুখে ধরিলেন।

ব্যোমকেশ নিজের দেশলাই জ্বালিয়া তাঁহার সিগারে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। তারপর বলিল, 'দেবকুমারবাবু, আপনার দেশলাইটা আমাদের দিতে হবে।'

দেবকুমারবাবুর চোখে আবার সচেতন দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু? আপনিও এসেছেন? ভয় নেই–আমি আত্মহত্যা করব না। ছেলেকে মেরেছি–মেয়েকে মেরেছি, আমি খুনী আসামীর মত ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চাই–'

ব্যোমকেশ বলিল, ‘দেশলাইয়ের বাক্সট তবে দিন।’

সাবধান, বড় ভয়ানক জিনিস। প্রত্যেকটি কাঠি এক-একটি মৃত্যুবাণ। একবার জ্বলিলে আর রক্ষে নেই—‘ বোমকেশ দেশলাইয়ের বাক্সটা বীরেনবাবুর হাতে দিল, তিনি সন্তর্পণে সেটা পকেটে রাখিলেন। দেবকুমারবাবু বলিয়া চলিলেন, ‘কি অদ্ভুত আবিষ্কারই করেছিলুম; পলকের মধ্যে মৃত্যু হবে, কিন্তু কোথাও এতটুকু চিহ্ন থাকবে না। আধুনিক যুদ্ধ-নীতির আমূল পরিবর্তন হয়ে যেত! বিষ নয়–এ মহামারী। কিন্তু সকলি গরল ভেল—’ তিনি বুকভাঙা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীরেনবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, ‘দেবকুমারবাবু, এবার যাবার সময় হয়েছে।’

‘চলুন’–তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ একটু কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনার স্ত্রী কি বাড়িতেই আছেন?’

‘স্ত্রী!’–দেবকুমারবাবুর চোখ পাগলের চোখের মত ঘোলা হইয়া গেল। তিনি হা হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ‘স্ত্রী! আমার ফাঁসির পর ইন্সিওরেন্সের সব টাকা সেই পাবে! প্রকৃতির পরিহাস নয়? চলুন।’

একটা ট্যাক্সি ডাকা হইল। ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া দেবকুমারবাবুকে তাহাতে তুলিয়া দিল; বীরেনবাবু তাঁহার পাশে বসিলেন। দুইজন কনস্টেবল ইতিমধ্যে কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহারাও ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিল।

দেবকুমারবাবু গাড়ির ভিতর হইতে বলিলেন, ‘ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার রেখার মৃত্যুর কিনারা করতে চেয়েছিলেন–আপনাকে ধন্যবাদ—’

আমরা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

দিন দুই বোমকেশ এ বিষয়ে কোনও কথা কহিল না। তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

তৃতীয় দিন বৈকালে সে নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল; এলোমেলোভাবে কতকটা যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিল–

‘ইংরেজিতে একটা কথা আছে–vengeance coming home to roost, দেবকুমারবাবুর হয়েছিল তাই! নিজের স্ত্রীকে তিনি মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এমনই অদৃষ্টের খেলা, দু’বার তিনি তাঁর অমোঘ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন, দু’বারই সে অগ্নিবাণ লাগল গিয়ে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যার বুকে।

'দেবকুমার অপ্রত্যাশিতভাবে এক আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে সে আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এ এমনই আবিষ্কার যে, তার পেটেন্ট নেওয়া চলে না; কারণ, সাধারণ ব্যবসায়-জগতে এর ব্যবহার নেই। কিন্তু ঘৃণাক্ষরে এর ফরমুলা জানতে পারলে জাপান জার্মানী ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধোদ্যত রাজ্যলোলুপ জাতি নিজেদের কারখানায় এই প্রাণঘাতী বিষ তৈরি করতে আরম্ভ করে দেবে। আবিষ্কর্তা কিছুই করতে পারবেন না, এতবড় আবিষ্কার থেকে তাঁর এক কপর্দক লাভ হবে না।

'সুতরাং আবিষ্কারের কথা দেবকুমারবাবু চেপে গেলেন। প্রথমে টাকা চাই, কারণ এ বিষ কি করে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আরও অনেক এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার। কিন্তু টাকা কোথায়? এত বড় এক্সপেরিমেন্ট গোপনে চালাতে গেলে নিজের ল্যাবরেটরি চাই–তাতে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে?

'এ দিকে বাড়িতে দেবকুমারবাবুর স্ত্রী তাঁর জীবন দুর্বাহ করে তুলেছিলেন। মানসিক পরিশ্রম যারা করে, তারা চায় সাংসারিক ব্যাপারে শান্তি, অথচ তাঁর জীবনে ঐ জিনিসটির একান্ত অভাব হয়ে উঠেছিল। এক শুচিবায়ুগ্রস্ত মুখরা স্নেহহীনা স্ত্রীর নিত্য সাহচর্য তাঁকে পাগলের মত করে তুলেছিল। এটা অনুমানে বুঝতে পারি; দেবকুমারবাবু স্বভাবত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নন, শান্তিতে নিজের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারলে তিনি আর কিছু চান না। তাঁর মনটি যে খুব স্নেহপ্রবণ, তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রতি ভালবাসা দেখেই আন্দাজ করা যায়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও চেষ্টা করলে এই স্নেহের অংশ পেতে পারতেন; কিন্তু স্বভাবদোষে তিনি তা পেলেন। না; বরঞ্চ দেবকুমারবাবু তাঁকে বিষবৎ ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন।

'নিজের স্ত্রীকে হত্যা করবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক নয়; যখন এ প্রবৃত্তি তার হয় তখন বুঝতে হবে–সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। দেবকুমারবাবুরাও সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। তারপর তিনি যখন এই ভয়ঙ্কর বিষ আবিষ্কার করলেন, তখন বোধ হয়, প্রথমেই তাঁর মনে হল স্ত্রীর কথা। তিনি মনে মনে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন।

'তারপর তাঁর সংশয়ের সমাধান করে বীমা কোম্পানির যুগ্মজীবন পলিসির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল-স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বীমা করতে পারে, একজন মরলে অন্য জন টাকা পাবে। এমন সুযোগ তিনি আর কোথায় পাবেন? যদি এইভাবে জীবনবীমা করে তাঁর আবিষ্কৃত বিষ দিয়ে স্ত্রীকে মারতে পারেন—এক ঢিলে দুই পাখি মরবে; তিনি তাঁর বাঞ্ছিত টাকা পাবেন, স্ত্রীও মরবে এমনভাবে যে কেউ বুঝতে পারবে না, কি করে মৃত্যু হল।

'দেবকুমারবাবু একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবনবীমা করলেন, তারপর অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি করলে চলবে না, বীমা কোম্পানির সন্দেহ হতে পারে। এইভাবে এক বছর কেটে গেল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, এই বড়দিনের ছুটিতে তাঁর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করবেন।

'তাঁর আবিষ্কৃত বিষের প্রকৃতি অনেকটা বিস্ফোরক বারুদের মত; এমনিতে সে অতি নিরীহ, কিন্তু একবার আগুনের সংস্পর্শে এলে তার ভয়ঙ্কর শক্তি বাষ্পরূপ ধরে বেরিয়ে আসে। সে-বাষ্প কারুর নাকে কণামাত্র গেলেও আর রক্ষে নেই, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।

'দেবকুমারবাবু তাঁর স্ত্রীর উপর এই বিষ প্রয়োগ করবার এক চমৎকার উপায় বার করলেন। বৈজ্ঞানিক মাথা ছাড়া এমন বুদ্ধি বেরোয় না। তিনি কতকগুলি দেশলাইয়ের কাঠির বারুদের সঙ্গে এই বিষ মাখিয়ে দিলেন। কি উপায়ে মাখালেন, বলতে পারি না, কিন্তু ফল দাঁড়ালো—যিনি সেই কাঠি জ্বালবেন, তাঁকেই মরতে হবে। এইভাবে বিষাক্ত দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি করে তিনি দিল্লীতে বিজ্ঞান-সভার অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ক্রমে দিল্লীতে যাবার সময় উপস্থিত হল; তখন তিনি সময় বুঝে তাঁর স্ত্রীর দেশলাইয়ের বাক্সতে একটি কাঠি রেখে দিয়ে দিল্লীতে যাত্রা করলেন। তিনি জানতেন, তাঁর স্ত্রী রোজ রাত্রিতে শোবার আগে ঐ দেশলাই দিয়ে ল্যাম্প জ্বলেন-এ দেশলাইয়ের বাক্স অন্যত্র ব্যবহার হয় না। আজ হোক, কাল হোক, গৃহিণী সেই কাঠিটি জ্বালাবেন। দেবকুমারবাবু থাকবেন তখন ন'শ মাইল দূরে—এ যে তাঁর কাজ, এ কথা কেউ মনেও আনতে পারবে না।

'সবই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। স্ত্রীর বদলে রেখা উনুন ধরাতে গিয়ে সেই কাঠিটি জ্বালালে।

'দিল্লী থেকে দেবকুমারবাবু ফিরে এলেন। এই বিপর্যয়ে তাঁর মন স্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও বিষিয়ে উঠল। তাঁর জিদ চড়ে গেল, মেয়ে যখন গিয়েছে, তখন ওকেও তিনি শেষ করে ছাড়বেন। কয়েকদিন কেটে গেল, তারপর আবার তিনি স্ত্রীর দেশলাইয়ের বাক্সে একটি কাঠি রেখে পাটনা যাবার জন্য তৈরি হলেন।

'কিন্তু এবার আর তাঁকে যেতে হল না। হাবুল সিগারেট খেত; বোধহয়, তার দেশলাইয়ের বাক্সটা খালি হয়ে গিয়েছিল, তাই সে সৎমার ঘরের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে কয়েকটি কাঠি নিজের বাক্সে পুরে নিয়ে বেড়াতে চলে গেল। তারপর–

'কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশী কালকূট যে দেবকুমারবাবু বিজ্ঞানসাগর মন্থন করে তুলেছিলেন তাঁর জীবনে—সকলি গরিল ভেল।'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। কিয়ৎকাল পরে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, দেবকুমারবাবু যে অপরাধী, এটা তুমি প্রথম বুঝলে কখন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে মুহূর্তে শুনলুম যে, দেবকুমারবাবু পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবনবীমা করিয়েছেন, সেই মুহূর্তে। তার আগে রেখাকে হত্যা করবার একটা সন্তোষজনক উদ্দেশ্যই পাওয়া যাচ্ছিল না। কে তাকে মেরে লাভবান হল, কার স্বার্থে সে ব্যাঘাত দিচ্ছিল-এ কথাটার ভাল রকম জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। রেখা যে হত্যাকারীর লক্ষ্য নয় , তা তো আমরা জানতুম না।

'কিন্তু আর একদিক থেকে একটি ছোট্ট সূত্র হাতে এসেছিল। রেখার দেহ-পরীক্ষায় যখন বিষ পাওয়া গেল না, তখন কেবল একটা সম্ভাবনাই গ্রহণযোগ্য রইল—অর্থাৎ যে-বিষে তার মৃত্যু হয়েছে, সে-বিষ বৈজ্ঞানিকদের অপরিচিত। মানে, নূতন আবিষ্কার। মনে আছে—দিল্লীতে দেবকুমারবাবুর বক্তৃতা? আমরা তখন সেটা অক্ষমের বাহ্বাস্ফোট বলে

উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কে জানত, তিনি সত্যই এক অদ্ভুত আবিষ্কার করে বসে আছেন; আর, তারই চাপা ইঙ্গিত তাঁর বক্তৃতায় ফুটে বেরুচ্ছে!

'সে যাক হোক, কথা দাঁড়ালো—এই নূতন আবিষ্কার কোথা থেকে এল? দুজন বৈজ্ঞানিক হাতের কাছে রয়েছে–এক, ডাক্তার রুদ্র, দ্বিতীয় দেবকুমারবাবু। এঁদের দুজনের মধ্যে একজন এই অজ্ঞাত বিষের আবিষ্কর্তা। কিন্তু ডাক্তার রুদ্রর উপর সন্দেহটা বেশি হয়, কারণ তিনি ডাক্তার, বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁরই বেশি। তা ছাড়া দেবকুমারবাবু বিষের আবিষ্কর্তা হলে তিনি কি নিজের মেয়ের উপর সে বিষ প্রয়োগ করবেন?

'কাজেই সব সন্দেহ পড়ল গিয়ে ডাক্তার রুদ্র'র উপর। কিন্তু তবু আমার মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। ডাক্তার রুদ্র লোকটা অতি পাজি, কিন্তু তাই বলে সে এত সামান্য কারণে একটি মেয়েকে খুন করবে? আর, যদিই বা সে তা করতে চায়, রেখার নাগাল পাবে কি করে? কোন উপায়ে আর একজনের বাড়িতে বিষ পাঠাবে? রেখার সঙ্গে মন্মথর ছাদের উপর থেকে দেখাদেখি চিঠি-ফেলাফেলি। চলত; কিন্তু রুদ্রর সঙ্গে তো সে রকম কিছু ছিল না।

'কোনও বিষাক্ত বাস্পই যে মৃত্যুর কারণ, এ চিন্তাটা গোড়া থেকে আমার মাথায় ধোঁয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে করে দেখ, রেখার এক হাতে পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি্‌, আর এক হাতে বাক্স ছিল; অর্থাৎ দেশলাই জ্বালার পরই মৃত্যু হয়েছে। সংযোগটা সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে, আবার কার্য কারণ সম্বন্ধও থাকতে পারে। দেবকুমারবাবু, কিন্তু বড় চালাকি করেছিলেন, বাক্সে একটি বৈ বিষাক্ত কাঠি দেননি–যাতে বাক্সের অন্যান্য

কাঠি পরীক্ষা করে কোনও হদিস পাওয়া না যায়। আমি সে বাক্সটা এনেছিলুম, পরীক্ষাও করেছিলুম, কিন্তু কিছু পাইনি। হাবুলের বেলাতেও বাক্সে একটি বিষাক্ত কঠিই ছিল, কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, সেইটেই হাবুল পকেটে করে নিয়ে এল–আর প্রথমেই জ্বালালে।

'অজিত, তুমি তো লেখক, দেবকুমারবাবুর এই ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড রূপক দেখতে পাচ্ছ না? মানুষ যেদিন প্রথম অন্যকে হত্যা করবার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, সেদিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ নির্মাণ করেছিল; আর আজ সারা পৃথিবী জুড়ে গোপনে গোপনে এই যে হিংসার কুটিল বিষ তৈরি হচ্ছে, এও মানুষ জাতটাকে একদিন নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে–ব্রহ্মার ধ্যান-উদ্ভূত দৈত্যের মত সে স্রষ্টাকেও রেয়াৎ করবে না। মনে হয় না কি?'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশকে ভাল দেখা যাইতেছিল না। আমার মনে হইল , তাহার শেষ কথাগুলো কেবল জল্পনা নয়–ভবিষ্যদবাণী।